Vol. 51 | No. 2 | 2014

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

সতীনাথ ভাদুড়ীর ছোটগল্পে দাম্পত্যজীবনচিত্র

Volume	51
Issue	2
Year	2014
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Momenur Rasul
Published online	February 1, 2014
DOI	10.62328/sp.v51i2.6
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v51i2.6
Pages	১০৯-১১৮
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

সতীনাথ ভাদুড়ীর ছোটগল্পে দাম্পত্যজীবনচিত্র

Check for updates

মোমেনুর রসুল*

আর্থ-সামাজিক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত নর-নারীর বিশেষ এক সম্পর্কের নাম দাম্পত্য। তাই 'দাম্পত্য কেবল স্বয়ম্ভু নর-নারী সম্পর্ক নয়, বরং তা সমাজ মনস্তত্ত্ব নির্ধারিত ও আর্থনীতিক-সংস্কৃতি সৃষ্ট একটি প্রতিষ্ঠান'। (সিরাজ, ২০০৬ : ২০৭) এ প্রতিষ্ঠান ব্যক্তির পারস্পরিক নির্ভরতা আর বিশ্বাস, কামনা-প্রাপ্তি, আনন্দ-সুখ এবং মোহ আর মায়াকাব্যের জালে অঙ্গীকারাবদ্ধ। বিবাহের মধ্য দিয়েই মানুষের দ্বিতীয় জীবনের যে সূচনা, বলা যায়, সেই জীবনের নাম দাম্পত্য। সাহিত্য সমাজবিচ্ছিন্ন কোনো বিষয় নয়। তাই বাংলা সাহিত্যে বিশেষত কথাসাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় দাম্পত্যজীবন অনুষঙ্গের বিচিত্র রূপ, বিবিধ সংকট উপস্থাপনের দৃষ্টান্ত বিরল নয়। উপন্যাসের ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর *বিষবৃক্ষ* (১৮৭৩) ও *কৃষ্ণকান্তের উইল* (১৮৭৮) উপন্যাসদ্বয়ে নরনারীর দাম্পত্যজীবন সংকটের যে স্বরূপ উন্মোচন করেছেন তাতে আর্থ-সমাজ সংশ্লিষ্ট বাস্তবতা গুরুত্ব পেয়েছে সর্বাধিক। পরবর্তী সময়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর *চোখের বালি* (১৯০৩) উপন্যাসে এতদসংক্রান্ত জট-জটিলতাকে মনস্তত্ত্বের গূঢ় ব্যঞ্জনায় প্রকাশ করেছেন। একইভাবে ছোটগল্পেও রবীন্দ্রনাথ নরনারীর দাম্পত্য সম্পর্কের নানা প্রান্ত চিত্রণ করেছেন। বিশেষ করে আর্থ-সমাজ কাঠামোর পরিমণ্ডলে রচিত 'একরাত্রি' (১৮৯১), 'শাস্তি' (১৮৯৩), 'মধ্যবর্তিনী' (১৮৯৩) প্রভৃতি গল্পে দাম্পত্য সম্পর্কের কিছু সমস্যা রূপলাভ করেছে। উনিশ শতকে রচিত এ সকল গল্পের 'সমস্যাগুলির মধ্যে অনেকক্ষেত্রেই একটি সামন্ততান্ত্রিক মানসিকতা বর্তমান'। (অনিন্দিতা, ২০০৫ : ৭৫) কিন্তু বিশ শতকের প্রারম্ভিক পর্যায়ে রচিত ছোটগল্পে রবীন্দ্রনাথ দাম্পত্যজীবন সংকট উন্মোচনে মনস্তাত্ত্বিক পরিপ্রেক্ষিতকে গুরুত্ব দিয়েছেন সর্বাধিক। 'তাঁর নিজ অভিজ্ঞতার জগৎ নাগরিক মধ্যবিত্ত-জীবন এ পর্যায়ের গল্পে ক্রমাগত প্রাধান্য লাভ করেছে। মানব-মানবীর রোম্যান্টিক হৃদয়-রহস্য, দ্বৈত প্রেমাবেগ, ঈর্ষা-দ্বেষ-ঘৃণার আবর্তন রবীন্দ্রনাথের পরিবর্তিত জীবনদৃষ্টির কাছে অনেকটা তাৎপর্যহীন হয়ে পড়েছে'। (রফিকউল্লাহ, ২০০২ : ১৫) 'নষ্টনীড়' (১৯০১) গল্পে চারুর প্রতি স্বামী ভূপতির ঔদাসীন্য, দেবর অমলের সঙ্গে নিঃসঙ্গ চারুর গড়ে-ওঠা মধুর সম্পর্ক যা ক্রমে দুর্নিবার ভালোবাসায় পরিণত হয়েছে, আর চারু ও ভূপতির অজান্তেই তাদের নীড় ভেঙে যাচ্ছে— সেই শৃঙ্খলিত দাম্পত্যজীবনের সূত্রগুলোকে নিপুণভাবে উপস্থাপনে এই পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গির ভূমিকাই মুখ্য। রবীন্দ্র-পরবর্তী ছোটগল্পের ধারায় নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, জগদীশ গুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র এমনকি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় দাম্পত্যজীবনের বহুমাত্রিক স্তর এবং বহুভঙ্গিম দৃষ্টিকোণ তুলে ধরেছেন তাঁদের রচনায়। অসুস্থ, ক্লেদাক্ত দাম্পত্যজীবনের বিচিত্র সংকট জগদীশ গুপ্ত ও নরেশচন্দ্রের গল্পে লক্ষ করা যায়। অপরদিকে দাম্পত্যজীবনে ত্রিকোণ প্রেমের সমস্যা ও জটিল রহস্যময় রূপ নির্মোহ দৃষ্টিতে উন্মোচিত হয়েছে প্রেমেন্দ্র মিত্র ও মানিকের গল্পে।

* সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

এরই ধারাবাহিকতায় সতীনাথ ভাদুড়ী (১৯০৬-১৯৬৫) তাঁর ছোটগল্পে দাম্পত্যজীবনচিত্রের বিচিত্র দিক উপস্থাপন করেছেন। ব্যক্তিজীবনে অকৃতদার সতীনাথ বাল্যকাল থেকে একটি নির্দিষ্ট দূরত্ব থেকে নির্মোহ দৃষ্টিতে তাঁর বাবা-মার দাম্পত্যজীবন পর্যবেক্ষণ করেছিলেন, দেখেছিলেন দাম্পত্যের মধ্যে সখ্যের অনুপস্থিতি, এমনকি তাঁদের মধ্যে ছিল সম্ভ্রমসূচক দূরত্বও। সেখানে কোনো সমঝোতাপূর্ণ স্বাভাবিক আবেগ ছিল না, ছিল সামাজিক বিধিবিধানসম্মত নির্দিষ্ট দাম্পত্যচুক্তি বা দায়বদ্ধতা। প্রবল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদে বিশ্বাসী ও তীব্র আত্মমর্যাদাশীল সতীনাথ পারিপার্শ্বিক অভিজ্ঞতার কারণেই সম্ভবত প্রচলিত দাম্পত্যজীবনে আস্থা রাখতে পারেননি। আর সে কারণেই তাঁর গল্প ও উপন্যাসে দাম্পত্য-সম্পর্কের অন্তর্জটিল বাস্তবতায় সমাজ-পরিপার্শ্ব অন্তর্গত ব্যক্তির শূন্যতা, অন্তঃক্ষরণ, যৌন অতৃপ্তি ও অবদমনের চিত্র উদঘাটিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে সমালোচকের মন্তব্য বিশেষভাবে গ্রহণযোগ্য :

> হিন্দু মধ্যবিত্তের বৈদিকমন্ত্রে পরিশুদ্ধ 'সাত পাকে বাঁধা' দাম্পত্যজীবনের আড়ালে যে পারস্পরিক অনাস্থা, শোষণ, ব্যক্তিত্বের অমর্যাদা এবং সর্বোপরি অবাঞ্ছিত অথচ অনস্বীকার্য অভ্যাসের দাসত্ব রয়েছে — এই অনুভবটি সতীনাথের গল্প ও উপন্যাসে বারবার আলোচিত হয়েছে। (দেবকুমার সাহা, ২০০৭ : ৯৩)

সমালোচকের এমন বিশ্লেষণধর্মী মতামতের উজ্জ্বল প্রতিফলন লক্ষ করা যায়, সতীনাথের অধিকাংশ উপন্যাস ও ছোটগল্পে। *জাগরী* (১৯৪৫) থেকে *দিগভ্রান্ত* (১৯৬৬) পর্যন্ত প্রায় প্রতিটি উপন্যাসেই ব্যর্থ দাম্পত্যের প্রতিধ্বনি শোনা যায়। *জাগরী*তে বাবা তাঁর রাজনৈতিক আদর্শের আধিপত্য দ্বারা মায়ের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে চেয়েছেন। তিনি ধরে নিয়েছেন তার সকল কাজেই মা'র সমর্থন থাকবে। অন্যদিকে মা'র মনে পুঞ্জীভূত হয়েছে আকাশ প্রমাণ ক্ষোভ। *অচিনরাগিণী* (১৯৫৪) উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র নতুনদিদিমা তাঁর ব্যর্থ দাম্পত্য নিয়ে অভিযোগ উত্থাপন করেছেন সারাজীবন ধরে। *সংকট* (১৯৫৭)-এ রেণু ও মণির দাম্পত্যের মধ্যে দেখা যায় উষ্ণ আবেগের বদলে শীতল অনাস্থা। *দিগভ্রান্ত* উপন্যাসটির মূল সমস্যা দাম্পত্যসম্পর্কের দিগভ্রান্তি। স্বামীর ব্যক্তিত্বের একচ্ছত্র আগ্রাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার জন্য অতসীবালা অবলম্বন করেছিলেন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে, ভেঙে গিয়েছিল তাদের দাম্পত্যজীবন। উপন্যাসের ন্যায় ছোটগল্পেও নারী-পুরুষের দাম্পত্যজীবনচিত্রের বহুমুখী বৈশিষ্ট্য উপস্থাপিত হয়েছে। কখনো শাণিত ব্যঙ্গে, কখনো কৌতুকের আবহে আবার কখনো সরাসরি ক্ষয়িষ্ণু দাম্পত্যের অন্তঃসারশূন্যতা সতীনাথের কয়েকটি গল্পে রূপায়িত হয়েছে।

মধ্যবিত্ত বাঙালির দাম্পত্যজীবনের গতানুগতিক সমস্যা নিয়ে রচিত সতীনাথের বিশিষ্ট গল্প 'পরিচিতা' (১৯৫৩)। বিহারের পটভূমিতে স্থাপিত আলোচ্য গল্পে পূর্ববঙ্গ থেকে আগত উদ্বাস্তু চাঁপা স্বল্প বেতনে মধ্যবিত্ত দম্পতি প্রশান্ত শৈলর সংসারে আসে পুরনো গৃহকর্মী বৃদ্ধা গুলটনের মার পরিবর্তে। মধ্যবিত্ত সংসারে দু-টাকা সাশ্রয়ের জন্য পুরনো ঝিকে পরিবর্তন করলেও এ গল্পের নায়িকা শৈলর মানসিক পরিবর্তন ঘটেছে তার শারীরিক দুর্বলতার সূত্রে। কারণ শৈল ছিল অম্বলের রোগী, 'চেহারা দিন দিন শুকিয়ে দড়ি পাকানো গোছের হয়ে যাচ্ছে।' (সতীনাথ, ১৪১৮ : ৩১৯) শরীরের এমন অসুস্থতায় মানসিকভাবে দুর্বল শৈল

মনে করে দাম্পত্যকে চিরস্থায়ী করতে গেলে শরীরই একমাত্র আশ্রয়। এর বাইরে সে দাম্পত্যজীবন বিষয়ে আর কিছু ভাবতে পারে না। শরীর নিয়ে এই হীনম্মন্যতা থেকেই তার মনে সৃষ্টি হয়েছে সন্দেহ, প্রশ্ন জেগেছে স্বামীর একগামিতা নিয়ে। আর তাই তিনদিন কাজ করার পর শৈল যখন বুঝতে পারল চাঁপার কাজের সুবিধার জন্য রাতের উচ্ছিষ্ট বাসনগুলো গৃহকর্তা প্রশান্তই কুলকুচি করে ভিজিয়ে রেখেছে তখন শৈল চাঁপাকে বিদায় দিয়ে পুরনো দাসিকেই বহাল রেখেছে। দাম্পত্যজীবনে নিরাপত্তাহীন শৈল স্বামীর এমন অদ্ভুত আচরণে ঘটনার কার্যকারণ সম্পর্ক যাচাই করার সুযোগ পায়নি। তাই সন্দেহের বশবর্তী হয়ে শৈল চাঁপাকে বিদায় দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চেয়েছে। লেখক স্ত্রীর এই সন্দেহগ্রস্ততাকে লঘু হাস্যরসের মধ্য দিয়ে উপস্থাপন করেছেন। আর তাই 'আপাতদৃষ্টিতে 'পরিচিতা' গল্পটিকে একটি সাধারণ কৌতুক গল্প মনে হলেও এর মধ্য দিয়ে নারী মনের অপার দুর্জ্ঞেয়তাকে অতি সহজেই লেখক প্রকাশ করেছেন'। (অরূপকুমার, ১৯৮৪ : ২০৫) দাম্পত্যজীবনের অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণে সতীনাথ অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। সমালোচক যথার্থই বলেছেন, 'সতীনাথ অকৃতদার তবু স্বামী-স্ত্রীর নানারকম সম্বন্ধ এঁকেছেন মুন্সিয়ানার সহিত'। (সন্তোষকুমার, ১৩৯২ : ১৯৯)

দাম্পত্যজীবনের নিরাপত্তাহীনতাজনিত গল্প 'বৈয়াকরণ' (১৯৫৫)-এ সতীনাথ নর-নারীর জৈবিক আকর্ষণ থেকে সৃষ্ট জটিলতার বিস্তৃত বিবরণ উল্লেখ করেছেন। গল্পটি এক শুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণ সংস্কৃত শিক্ষক তুরন্তলাল মিশ্রকে নিয়ে রচিত হলেও এর উল্লেখযোগ্য একটি অংশে উপস্থাপিত হয়েছে পণ্ডিত তুরন্তলালের ছোট শ্যালকের দাম্পত্যজীবন প্রসঙ্গ। গল্পে সামাজিক অনুমোদন নিয়ে তাদের জৈবিক চাহিদা পূরণ হলেও মানসিক সংযোগ ঘটেনি। তারা পরস্পর দৈহিকভাবে সংসর্গে আসলেও মানসিক আকর্ষণ ও বিশ্বাসের আনুগত্য স্বীকার করেনি। আর তাই অগ্নিদগ্ধ মৃত্যুপথযাত্রী শ্যালকপত্নী শালাজের হৃদয় উৎসারিত দীর্ঘশ্বাস মিশ্রিত উক্তি 'ওরা কি তাই চায়' কেবল কোনো ব্যক্তি বিশেষের প্রতি উত্থাপিত বিচ্ছিন্ন প্রশ্ন নয়, তা যেন নির্বিশেষ পুরুষের প্রতি সংশয়হীন এক অনুভব; তথাকথিত বৈধ দাম্পত্য যে বাস্তবিকই অন্তঃসারশূন্য তার প্রমাণ পেয়েছেন পণ্ডিত তুরন্ত লাল সারাদিন ধরে ক্লাসে পাঠদানের সময় উক্ত শব্দ ও বাক্যের চুলচেরা বিশ্লেষণে, সচেতন ও অবচেতন মনের দ্বান্দ্বিকতায়। পণ্ডিত শ্যালকের দাম্পত্যসম্পর্কে কেবল জৈবিক তাড়নাই ছিল মুখ্য; ফলে শ্যালকপত্নীর অগ্নিদগ্ধ হবার করুণ ঘটনা শ্যালকের মনে এতটুকু প্রভাব ফেলেনি। সম্পর্কের এই ট্রাজিক পরম্পরা ও সময় সম্পৃক্ততার ফলে উদ্ভূত দাম্পত্যের অন্ত র্জটিলতা সমগ্র গল্পটিকে অসাধারণ করে তুলেছে। দাম্পত্যসম্পর্কে এরূপ মনোভাব প্রসঙ্গে ড. পার্থ চট্টোপাধ্যায় বলেছেন :

> শুধু জৈবিক বা বাহ্যিক আকর্ষণের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা সম্পর্কের ভিত খুব দুর্বল হয়। পারস্পরিক সম্পর্কে যখন সমমর্মিতা, ধর্মীয় ও আত্মিকবন্ধন থাকে তখনই সেই সম্পর্ক হয় সুখপ্রদ এবং দীর্ঘস্থায়ী। জৈবিক সত্তা আমাদেরকে ভাবায় আমি কী পাবো? আর আত্মিক সত্তা ভাবতে শেখায় আমি কী দিতে পারি? দাম্পত্য জীবন সম্পর্কে সাধারণ ধারণা হলো আমি কী পাবো। কিন্তু মৌলিক সত্য হচেছ ; যতই আমরা দিতে থাকবো, প্রাকৃতিক প্রতিদানের নিয়ম অনুযায়ী আমরা ততই পেতে থাকবো। নিঃশর্ত ভালোবাসা যে সম্পর্ক তৈরি করে, কোনো চাহিদা-চুক্তি-কর্তৃত্ব সেরকম সম্পর্ক তৈরি করতে পারে না। (পার্থ, ২০০৮ : ৫১)

আসলে বৈধ দাম্পত্যের ব্যাকরণে পরিচালিত সম্পর্কের আপাত নিশ্চয়তার মধ্যে থাকে এক অমোঘ নিস্পৃহতা যা সামাজিক বহিঃকাঠামোকে অতিক্রম করে মনস্তাত্ত্বিক আবেগহীনতায় গ্রাস করে, নিশ্চিত সম্পর্কের জালের মধ্য দিয়ে অন্তর্হিত হয়ে যায় প্রেম ও বিশ্বাস— এই অনুভবই ব্যক্ত হয়েছে 'বৈয়াকরণ' গল্পের আখ্যানবৃত্তে। 'ব্যক্তিগত জীবনে সতীনাথ সংসারী না হলেও তিনি যে কত জীবনমুখী লেখক ছিলেন 'বৈয়াকরণ' গল্পটি তারই স্বাক্ষর বহন করছে।' (অরূপকুমার, ১৯৮৪ : ২১৪) গল্পটির উপস্থাপনশৈলী অনন্য, সচেতন শিল্পীর সযত্নচর্চা এবং আদ্যন্ত মননশীলতায় বিনির্মিত।

সতীনাথ কেবল দাম্পত্যজীবনে নিরাপত্তাহীনতার প্রশ্নে নারীর মধ্যেই নয়, পুরুষের মনেও যে সক্রিয় প্রভাব বিস্তার করে তার উজ্জ্বল চিত্র তুলে ধরেছেন 'বাহাত্তুরে' (১৯৫৯) গল্পের শ্রীদাম সাহা চরিত্রের মাধ্যমে। বস্তুত 'আপাত হাসির গল্পটির মধ্যে এক বৃদ্ধ দম্পতির পরস্পর বিচ্ছেদের আশঙ্কায় উদ্বেলিত হৃদয়ের করুণ আর্তনাদ প্রতিধ্বনিত হয়েছে'। (অরূপকুমার, ১৯৮৪ : ২২৮) আলোচ্য গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র বাহাত্তর বছর বয়সী বৃদ্ধ শ্রীদামবাবু মনে করেন, তাঁর জীবনের বাঁচা-মরা নির্ভর করে তাঁর স্ত্রীর সিঁথিতে লাল সিদুঁরের ওপর :

> মৃত্যুর পূর্বস্বাদ তিনি পেয়ে গিয়েছেন; ঠিক যখন সৃষ্টিধরের মা সিঁথির সিঁদুর মুছে ছেলের আনা মেটে সিঁদুর সিঁথিতে দিয়েছেন, তখনই করোনারি রোগটা তাঁকে চেপে ধরে; এ সম্বন্ধে তাঁর আর কোন সন্দেহ নেই। (সতীনাথ, ১৪১৯ : ৪৭৯)

অথচ বিয়ের সময় থেকেই এই লাল সিঁদুর মাথায় দিয়েই তাঁর স্ত্রীর এলার্জি এবং সাতষট্টি বছর পর্যন্ত তিনি হাঁপানি রোগে ভুগছেন। নরেন ডাক্তারের পরামর্শে তিনি যেদিন থেকে মাথায় মেটে সিঁদুর ব্যবহার আরম্ভ করলেন সেদিন থেকেই দীর্ঘ হাঁপানি রোগ থেকে মুক্তি পেলেন। শ্রীদাম বাবুর অভিমানের সূত্রপাত এখান থেকেই। তিনি বিশ্বাস করেন সিঁথিতে সিঁদুর না পরার অর্থ স্বামীর মৃত্যু ডেকে আনা। তাই স্ত্রীর এই আরোগ্য লাভের ঘটনা স্বামীর দৃষ্টিতে চূড়ান্ত স্বার্থপরতা — 'নিজের স্বার্থ নিয়েই উন্মত্ত। এগারোটি সন্তানের জননী। সংসারের লক্ষ্মী'। (সতীনাথ, ১৪১৯ : ৩৭৬) বৃদ্ধ শ্রীদামবাবু আসলে পরিবারের সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী হওয়ায় তাঁর একমুখী আচরণ সাময়িক দাম্পত্য অভিমানের জন্ম দিয়েছে। 'পরিবার বৃত্তের মধ্যে সম্পর্কের এই অবনতি এর জন্য আর্থসামাজিক অবস্থা যতখানি দায়ী তার চেয়ে দায়ী আমাদের অজ্ঞতা, আত্মকেন্দ্রিকতা ও স্বার্থপরতা'। (পার্থ, ২০০৮ : ৮০) আসলে সুখী ও সমৃদ্ধ সম্পর্কের আড়ালে লুকিয়ে থাকা চরম আত্মকেন্দ্রিকতা ও কর্তৃত্বকে বাহাত্তুরের বাতিকের আবরণে সকৌতুকে উদঘাটন করেছেন লেখক। বৃদ্ধ দম্পতির জীবনচিত্রের এমন সরস উপস্থাপন গল্পটিকে স্বকীয় করে তুলেছে নিঃসন্দেহে।

বৃদ্ধ দম্পতির ভিন্ন এক দাম্পত্যজীবনচিত্র অঙ্কিত হয়েছে 'চকাচকী' (১৯৫৪) গল্পে। তবে পূর্বোক্ত গল্পের মধ্যে দাম্পত্যের যে প্রাতিষ্ঠানিক আধিপত্য দেখা গেছে, আলোচ্য গল্পে সেই প্রসঙ্গটি সচেতনভাবে এড়িয়ে গেছেন লেখক। সমাজ অননুমোদিত দাম্পত্যজীবনে নেই কোনো ছকে বাঁধা জীবনাচরণ ও সম্পর্ক টিকিয়ে রাখার সামাজিক দায়বদ্ধতা। তাই সে দাম্পত্য মধুর — এমনই এক গল্প এটি। উত্তম পুরুষের দৃষ্টিকোণ উৎসারিত দীর্ঘায়তন

এই গল্পটি ছোটগল্পের প্রচলিত সীমারেখার বাইরে। বিহারের গ্রামীণ পটভূমিতে রচিত এ গল্পের আখ্যান পরিকল্পনায় সতীনাথ তাঁর রাজনৈতিক জীবনাভিজ্ঞতাকে তুলে এনেছেন। রাজনৈতিক জীবনে দীর্ঘদিনের সহকর্মী কানা মুসাফিরলালের সঙ্গে বিহারের বিভিন্ন গ্রামে ঘুরে বেড়ানোর একটি স্মরণীয় ঘটনা নিয়ে রচিত এ গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র পঁয়ষট্টি বছর বয়সী দুবেজী-দুবেনীর দাম্পত্য প্রেমের মাধুর্য ও উষ্ণতা লক্ষ করে সতীনাথ শুরুতেই বলেছেন, 'এ আমার শ্রদ্ধাঞ্জলি, একটি প্রেমের প্রতি।' (সতীনাথ, ১৪১৯ : ২৮৩) তাদের সম্পর্কের গভীরতা পর্যবেক্ষণ করে লেখক এই দম্পতির নাম দিয়েছিলেন 'চকাচকী', 'ঠাট্টা করে নয়, ভালবেসে। হয়তো একটু ঈর্ষাও মেশানো ছিল ঐ নামকরণের সঙ্গে'। (সতীনাথ, ১৪১৯ : ২৮৩) 'দুবেজী-দুবেনীর প্রেমের একাগ্রতা ও আত্যন্তিকতা বোঝাতে সতীনাথ এই লোকপ্রচল ব্যঞ্জনাকেই যেন গ্রহণ করেছেন'। (শ্রাবণী, ২০০৬ : ৪১৪) বৃদ্ধ বয়সেও এই দম্পতির পারস্পরিক খুনসুটি, কথাবার্তা লক্ষ করে লেখকের 'অবাক লেগেছিল বিয়ের পঞ্চাশ বছর পরও এই দম্পতি, বিয়ের সময়ের মনের উপচে পড়া ভাব বজায় রেখেছে দেখে'। (সতীনাথ, ১৪০৯ : ২৮৩) দুবেজী অসুস্থ হয়ে যখন প্রায় মৃত্যুশয্যায় উপস্থিত তখন লেখক জানতে পারলেন তাদের অতীত কাহিনী। দীর্ঘ চল্লিশ বছর ধরে জমে থাকা বুকের পাথরের ভার সরিয়ে দুবেনীর স্বীকারোক্তি 'চকাচকী'র প্রেমকে অন্য চালচিত্রে স্থাপন করে :

> শোনো তবে বলি। যে কথা বলিনি চল্লিশ বছর থেকে। পোড়ামুখ! আমি দুবেজীর নিকট আত্মীয়া। দুবেজীর বউ ছিল, ছেলে ছিল, সব ছিল। তারা আমারও আপনার লোক। ফিরবার পথ জন্মের মতো বন্ধ হয়ে গেল জেনেও এসেছিলাম। — কিন্তু নিজের ছেলে থাকতে তার হাতের জল না পেয়ে দুবেজী চলে যাবে, তা কি হয়? মুখে আগুনটুকু পাবে না? (সতীনাথ, ১৪১৯ : ২৮৯)

বস্তুত দাম্পত্যের এই দীর্ঘ পথপরিক্রমায় দুবেজী-দুবেনীর প্রাণোচ্ছলতায় কোনো ঘাটতি পড়েনি। প্রকৃতপক্ষে বহমান এই জীবনের অন্তর্দেশে লুকায়িত অবৈধ প্রণয়চিত্র উন্মোচনে গল্পকার প্রাতিস্বিক প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। তাই গল্পের শেষে দুবেজী পুত্র কর্তৃক দুবেজীর সৎকারমুহূর্তে দুবেনী তার চল্লিশ বছরের দাম্পত্য সঙ্গীকে ছেড়ে অদৃশ্য থাকলেও অনুপস্থিত থাকতে পারেনি; শ্মশানঘাটের কাশবনের আড়ালে আত্মগোপন করে চোখের পানিতে তার আত্মিক বন্ধনে আবদ্ধ সঙ্গীকে বিদায় জানিয়েছে। 'সমাজের অনুমোদন না পেলেও সম্পর্ক যে অলীক হয়ে যায় না, সেই হৃদয়বৃত্তান্ত এই চকাচকী গল্প'। (শ্রাবণী, ২০০৬ : ৪১৭) দুবেজীবিহীন দুবেনীর নীড়-বিচ্যুত দাম্পত্য তাই গল্পের পরিণাম অংশে মনোযন্ত্রণার বাস্তবতা হয়ে উঠেছে।

দাম্পত্যজীবনের ইতি ও নেতি—এই পরস্পর বিপরীতমুখী ভাবনাপুঞ্জ নিয়ে রচিত 'তবে কি...!' (১৯৫৬) গল্পে সতীনাথ ইংরেজ রাজপুরুষদের বিচিত্র সম্পর্কের আলেখ্য নির্মাণ করেছেন, বিশেষ করে ইংরেজদের একাধিক বিয়ে এবং বিবাহোত্তর দাম্পত্য জটিলতার স্বরূপ উন্মোচনে সতীনাথ সচেতন দৃষ্টিভঙ্গির স্বাক্ষর রেখেছেন। গল্পের প্রধান চরিত্র পেরীসাহেবের আকৃতিতে ছিল আদিম মানুষের বন্যতা, প্রকৃতিতে ছিল স্বাভাবিক সারল্য ও নৈতিকতা। রবার্টসনের মেয়ে পেরী সাহেবের প্রদীপ্ত পৌরুষে আকৃষ্ট হয়ে তাকে বিয়ে করে। কিন্তু এক

বছর অতিক্রান্ত না হতেই বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে তাদের। গল্পে রবার্টসনের যে মেয়ে পৌরুষ দেখে পেরীর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল সে-ই পরবর্তীকালে স্বামীর বিরুদ্ধে পুরুষত্বহীনতার অভিযোগ তুলে দাম্পত্যসম্পর্কের বিচ্ছেদ ঘটায়। এরপর সার্জেন্ট মেজর ওব্রায়েনের সঙ্গে রবার্টসনের মেয়ের বিয়ে হলেও তা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। যুক্তি হিসেবে দ্বিতীয় স্বামীর মধ্যে সে আরোপ করে কাপুরুষতা ও মনুষ্যত্বের অভাব। অপরদিকে পেরীসাহেবও দ্বিতীয়বার বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। যদিও সমাজ সে বিয়েকে স্বীকৃতি দেয়নি; কারণ তার স্ত্রী মিসিজ পেরী বারাঙ্গনা। অথচ সমাজ অসমর্থিত এই দাম্পত্যজীবনে পেরী ও পেরী পত্নী সুখী। বহুভোগ্যা মিসিজ পেরী বহু মানুষের কাছ থেকে পুরুষত্বের প্রমাণ পেয়েছিল, কিন্তু পায়নি মনুষ্যত্বের পরিচয়; পেরীসাহেবের কাছে সে পেয়েছিল মানবিকতা অর্থাৎ স্ত্রীর যথাযথ মর্যাদা এবং ভালোবাসা। কেবল তাই নয়, মিসিজ পেরী তার স্বামীর কাছে এতটাই ভালোবাসা পেয়েছিল যে মনের ঈর্ষার বোধকে সে অতিক্রম করেছিল। মৃত্যুপথযাত্রী পেরীর স্ত্রী যখন তার স্বামী ও রবার্টসনের মেয়ের পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকা দু'জোড়া চোখের চাহনির মধ্যে খুঁজে পেয়েছিল পারস্পরিক আকর্ষণ ও ভালোবাসা তখন তার মনে ঈর্ষা নয়; স্বস্তির ভাব জাগ্রত হয়েছিল। লেখক এখানে দুই বিপরীত নারীর দাম্পত্যসম্পর্কের যে দৃষ্টান্ত পরিবেশন করেছেন তা সত্যিই অভিনব ও বিস্ময়কর। তাই 'গল্পটিতে একদিকে যেমন সতীনাথ ভাদুড়ীর নিরাসক্ত শিল্পদৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়; তেমনি অপরদিকে মানব-সন্ধানী জীবনরসিক মনের সাক্ষাতও লাভ করি'। (অরূপকুমার, ১৯৮৪ : ২২৩)

সতীনাথের দৃষ্টি কেবল ইংরেজ চরিত্র কিংবা বিহারের মধ্যবিত্ত নারী-পুরুষের দাম্পত্যসম্পর্কের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি; দরিদ্র, নিম্ন শ্রেণির দাম্পত্যজীবনচিত্রও তাঁর গল্পে স্থান পেয়েছে। এরকমই একটি গল্প 'অভিজ্ঞতা' (১৯৫৬)। এখানে মূলত দুই ভিন্ন শ্রেণির দাম্পত্যজীবন বর্ণিত হয়েছে। এর একটি অংশ মধ্যবিত্ত শ্রেণির রামভরোসা প্রসাদ দম্পতি অপরটি দরিদ্র অন্ত্যজ শ্রেণির বিরসা মাঝি দম্পতি। তবে গল্পটিতে বিরসা মাঝি দম্পতির রিরংসা, হিংসা এবং সন্দেহের বন্য আদিমতার চিত্র প্রাধান্য পেয়েছে বেশি। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র রামভরোসা প্রসাদ সৎ ও আরামপ্রিয়। থানার দারোগা হিসেবে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করলেও তার পদোন্নতি না দেখে স্ত্রীও খানিকটা উৎকণ্ঠিত। তবে মধ্যবিত্ত এ দম্পতি তাদের গণ্ডিবদ্ধ জীবনযাপনে অসুখী নয়। গল্পের অপর দম্পতি সাঁওতালটুলির বিরসা মাঝি আর তার স্ত্রীর ভগ্ন, অসুস্থ দাম্পত্য সম্পর্ক সমগ্র গল্পটিকে ভিন্ন মাত্রা এনে দিয়েছে। গল্পে এই দম্পতির আকস্মিক আবির্ভাব ঘটে থানার দারোগার ওপর ন্যস্ত এক খুনের ঘটনার তদন্তে। সাঁওতালটুলির বিরসা মাঝি তার পূর্বপুরুষের কুড়াল দিয়ে তারই তিন মাসের পুত্রকে খুন করেছে। খুনীর স্ত্রীর এই অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে পুত্র-হন্তারক বিরসা জানায় তার স্ত্রীর দাম্পত্য-বহির্ভূত প্রণয়-সম্পর্কের কথা। স্ত্রীর অবৈধ প্রণয়কে কোনোভাবেই স্বীকার করতে পারেনি বিরসা; তাই বংশের কলঙ্ককে চিরতরে বিনাশ করতে তার এতটুকু সমস্যা হয়নি। দরিদ্র অন্ত্যজ এই দম্পতির ঈর্ষা এবং ক্ষোভ থেকে সৃষ্ট জটিলতা গল্পে ভিন্ন মাত্রা এনে দিয়েছে নিঃসন্দেহে ।

নর-নারীর দাম্পত্যজীবনের মধ্যে পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতা, সম্পর্কহীনতা, নিস্পৃহতা, তীব্র অতৃপ্তি, যন্ত্রণা আর বিষাদময় অনুভূতির অনবদ্য প্রকাশ ঘটেছে 'কম্যাণ্ডার-ইন-চীফ'

(১৯৫৮) গল্পে। এখানে দুটি বিপরীতমুখী মানুষের দৈনন্দিন জীবনাচরণের সঙ্গে তাদের মনোজগতের ক্রমাগত দ্বন্দ্ব ও সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে যে জীবন অতিক্রান্ত হয়েছে তার অন্তর্লোকে বিদ্যমান পারস্পরিক দাম্পত্যসম্পর্কে হতাশার চোরাবালি — যে চোরাবালিময় দাম্পত্যজীবন আধুনিক মানুষের অন্তঃসারশূন্যতাকে নির্দেশ করে। গল্পের শুরু রেলের অফিসার মুখার্জি সাহেবের আকস্মিক আত্মহত্যার ঘটনা পরিবেশনের মাধ্যমে। স্বীকারোক্তিমূলক চিঠিতে স্বয়ং মুখার্জি সাহেব এই মৃত্যুর জন্য কাউকে দায়ী করেননি। কিন্তু প্রতিবেশীদের স্বগতচিন্তার মধ্য দিয়ে জানা যায়, দুর্ঘটনার নেপথ্যে রয়েছে চিরাচরিত দাম্পত্য কলহ। এই দাম্পত্য কলহে স্বামী-স্ত্রীর মানসিক বৈপরীত্য সৃষ্টি করেছে অনতিক্রমণীয় বাস্তবতার। গয়লা, ধোপা, মুদি, চাকর প্রত্যেকে জানে মুখার্জি স্ত্রীর 'তিরিক্ষি মেজাজ', 'নাক সিটকানো স্বভাব', 'বড়লোকের মেয়ের দেমাকি' মনোভাব এবং 'খরচে স্বভাব'। যে বলে দাম্পত্যের ক্ষেত্রে এক হাতে তালি বাজে না তাদের উদ্দেশে লেখকের সতর্ক উচ্চারণ, 'সে যেন একবার 'কম্যান্ডার-ইন-চীফ্'-কে দেখে যায়'। (সতীনাথ, ১৪১৯ : ৩৬৪) অর্থকেন্দ্রিক বহির্মুখীনতা ও কর্কশ স্বভাব মুখার্জি স্ত্রীর এমন আচরণ তাদের দাম্পত্যকলহে পালন করেছে সীমাহীন ভূমিকা। এই দাম্পত্য কলহ, বাড়ির গৃহকর্মীদের সামনে স্ত্রীর দ্বারা অপমান ও ভর্ৎসনা মুখার্জি সাহেবকে আত্মহত্যায় প্ররোচিত করেছে যা গল্পে সতীনাথ বাস্তবোচিতভাবে উপস্থাপন করেছেন। মুখার্জির অন্তর্মুখী ও তার স্ত্রীর বহির্মুখী জীবনবোধের বৈসাদৃশ্যে তাদের দাম্পত্য প্রায় ধূলিধূসর হয়ে উঠেছে। এই ধূলিমলিন জীবনসংকটের বলি মুখার্জি সাহেবের করুণ পরিণতি গল্পের পট-পরিবেশকে বিয়োগান্তক করে তুলেছে। দাম্পত্য কলহের ক্ষেত্রে যে কেবল পুরুষ নয়, নারীরও রয়েছে উজ্জ্বল ভূমিকা সেই বিষয়টিই এ গল্পে প্রতিভাত হয়েছে।

দাম্পত্যজীবনে পারস্পরিক সম্পর্কের নেপথ্যে যে গভীর ঘৃণা, উপেক্ষা ও আত্মকেন্দ্রিকতার উদ্ভব ঘটে তার এক ভিন্নতর ব্যঞ্জনা রূপায়িত হয়েছে 'পূতিগন্ধ' (১৯৫৯) গল্পে। মূলত অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার ফলে ব্যক্তির যে মনোজাগতিক দ্বন্দ্ব তৈরি হয় তার এক নিপুণ চিত্র এখানে অঙ্কন করেছেন লেখক। নিজ আত্মজা রিনির বিয়েকে কেন্দ্র করে নাজিরবাবুর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী মৃণালিনীর দৃষ্টিকোণ থেকে লেখক প্রকাশ করেছেন তার দাম্পত্যজীবনের যন্ত্রণা, ক্ষোভ আর স্বামীর নির্মম স্বার্থপরতার প্রতি তীব্র ঘৃণার ব্যঙ্গচিত্র :

> মাইনের পঁচাশি টাকা মাস পয়লা এনে হাতে তুলে দেওয়া ছাড়া আর কোনো সম্বন্ধ নাই এ সংসারের সঙ্গে! বাড়ির কেউ অসুখ হয়ে মরল কিনা, আজকে হাঁড়ি চড়ল কিনা — কোনো কিছু জানবার প্রয়োজন নাই। শুধু নিজের দরকারের জিনিসগুলো হাতের কাছে পাওয়া চাই। তাহলেই হল! (সতীনাথ, ১৪১৯ : ৪২৩)

আত্মসুখসর্বস্ব অর্থনৈতিকভাবে অসচ্ছল স্বামীর দাম্পত্যসম্পর্কের ক্ষেত্রে অনাস্থা আর চরম উপেক্ষার ফলে মৃণালিনীর মনে ক্রমশ ভয় থেকে বিতৃষ্ণা এবং শেষ পর্যন্ত তীব্র অসন্তোষের জন্ম দিয়েছে। 'অসচ্ছলতা সুস্থ দাম্পত্যসম্পর্কের সাবলীল বিকাশে অন্যতম বাধা। অসচ্ছলতা প্রত্যক্ষভাবে ব্যক্তিত্বের দৃঢ়তা ও বোধের পারম্পর্যকে ভেঙে দিয়ে মনোজটিলতার সৃষ্টি করে, যার অনিবার্য প্রভাব পড়ে নর-নারীর পারস্পরিক সম্পর্কে'। (সিরাজ, ২০০৬ : ২১৭) এরকম ভগ্ন দাম্পত্যজীবনের বোঝা বহন অর্থহীন; তাই 'মনের

ভিতরের এতকালকার পুঞ্জীভূত গ্লানি ও বদ্ধ আক্রোশ আজ তাকে মরিয়া করে তুলেছে'। (সতীনাথ, ১৪১৯ : ৪৩৩) সতীনাথ সমাজ-সময়-সত্তাবিযুক্ত ব্যক্তির অন্তর্জগৎ উন্মোচন করেছেন আলোচ্য গল্পের নাজির বাবুর স্ত্রী মৃণালিনীর দৃষ্টিকোণ প্রয়োগে। রূঢ় আবেগহীন বাস্তবতার নিরাসক্ত বর্ণনায় সতীনাথ এ গল্পে যে দাম্পত্যজীবনচিত্র অঙ্কন করেছেন তা বাংলা ছোটগল্পের ধারায় স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত। বিবর্ণ দাম্পত্যের ধূসর ছায়া এ গল্পের মৃণালিনী চরিত্রকে বেষ্টন করে রেখেছে অনুক্ষণ। তাই দাম্পত্যের রোমান্টিকতার স্বপ্নিল আবেশকে লেখক পরিহার করেছেন মৃণালিনীর জীবন থেকে। স্বামীর নির্লিপ্ততা আর ঔদাসীন্যের ফলে নিরেট বাস্তবের নিরাভরণ ভূমিতেই গড়ে উঠেছে তার দাম্পত্যজীবন।

সতীনাথ কেবল বিহার কিংবা পূর্ণিয়ার অধিবাসীদের দাম্পত্যজীবন গল্পে চিত্রিত করেননি, এর বাইরেও বিভিন্ন অঞ্চলের নরনারীর পারস্পরিক সম্পর্কের অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ উপস্থাপন করেছেন। ভারত-নেপাল সীমান্ত অঞ্চলের পটভূমিতে রচিত 'দাম্পত্য সীমান্ত' (১৯৬০) গল্পে মধ্যবিত্ত এক দম্পতির বন্ধনহীন গ্রন্থিময় জীবনের করুণ আলেখ্য বর্ণিত হয়েছে। পাশাপাশি মধ্যবিত্তের নৈতিক বিচ্যুতির পরিচয় এ গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র নিবারণের মাধ্যমে উপস্থাপিত হয়েছে। গল্পের প্রারম্ভে চাকরিজীবী পোস্টমাস্টার নিবারণ পদোন্নতির স্বার্থে স্ত্রী অসীমাকে শেঠজির সামনে বসিয়ে রেখে অনায়াসে ঘণ্টা দুয়েক পরে ফিরে আসে। ধনী হবার উচ্চাশায় যে কোনো হীন কাজ করতেও তার দ্বিধা নেই এর প্রমাণ মেলে গাঁজা চোরাকারবারি ব্যবসার দৃশ্যে। নিষিদ্ধ উপায়ে ক্রমাগত অর্থ-বিত্তের পেছনে ছুটতে গিয়ে দাম্পত্য নিয়ে কখনোই নিবারণের সুস্থ ভাবনা জাগ্রত হয়নি। স্থূল রুচিবোধসম্পন্ন নিবারণ তাই স্ত্রীকে উপার্জনের সোপান হিসেবেই ব্যবহার করতে চেয়েছে এবং করেছে। ফলে দাম্পত্য জীবনে তাদের কোথাও মানসিক সম্মিলন ঘটেনি; হৃদয়হীন অনুভবপুঞ্জ অন্ত রায় হয়ে উঠেছে সুস্থ জীবন যাপনে। অথচ এসব কাজে অনাগ্রহী স্ত্রী অসীমা চেয়েছে সুখী, সমৃদ্ধময় এক বর্ণিল দাম্পত্যজীবন। কেননা :

> দাম্পত্য জীবনের আদর্শ গড়ে ওঠার প্রাথমিক শর্তই হলো বন্ধুত্ব, বিশ্বাস, শ্রদ্ধা ও মতাদর্শগত মিল। যে দম্পতির জীবনে এইসব প্রাথমিক শর্তগুলো অনুপস্থিত সেখানে সম্পর্কের বোঝা টানা অর্থহীন, নীতিহীন এবং সুস্থ মানসিকতার পরিপন্থী। (প্রবীর, ১৯৯৩ : ১৭৩)

তাই দাম্পত্য সম্পর্ক টিকিয়ে রাখার জন্য 'তাকে অনেক কিছু নতুন করে শিখতে হয়। ইচ্ছা থাক, আর নাই থাক'। (সতীনাথ, ১৪১৯ : ৩১৩) নিঃসঙ্গ অসীমার মানসিক দুঃখ, যন্ত্রণার লাঘবে গল্পে উপস্থিত রেলস্টেশনের মালবাবুর ভাই সমীরের সঙ্গে স্ত্রীর আলাপচারিতায় ঈর্ষান্বিত ও ক্ষুব্ধ হয় স্বামী নিবারণ। কিন্তু ক্ষুব্ধ নিবারণ স্ত্রীর এরূপ স্বাভাবিক আচরণকে সহজভাবে গ্রহণ করতে পারে না। এমনকি চোরাকারবারের দায়ে অভিযুক্ত নিবারণ পুলিশের ভ্যানে যখন গল্পরত অসীমা আর সমীরকে দেখতে পায় তখন সে তার ঈর্ষা আর বিদ্বেষ মিশ্রিত কণ্ঠে পুলিশকে উদ্দেশ্য করে বলে ওঠে, 'কি পরিমাণ বদ দেখছেন তো হুজুর মেয়েমানুষটা। নাগরকে বাঁচিয়ে স্বামীকে জেলে পুরতে চায়।' (সতীনাথ, ১৪১৯ : ৩১৯) যে সম্পর্ক অন্তরের জোরে যুক্ত নয়, মন্ত্রের জোরে শৃঙ্খলিত ; যেখানে প্রেম আর বিশ্বাস অপেক্ষা ঈর্ষা ও বিদ্বেষ সক্রিয় সেই ভগ্ন, চূর্ণ, শিথিল দাম্পত্যের এক নিপুণ চিত্র এ গল্প। উল্লেখ্য এ গল্পের সঙ্গে সুবোধ ঘোষের 'দুঃসহধর্মিনী' গল্পের

সাযুজ্য স্মরণযোগ্য। নিবারণের মতো এ গল্পের নায়ক কমলেশও তার স্ত্রী ধীরার প্রতি যে অকর্তব্য অন্যায় আচরণ করেছেন সে সম্পর্কে তার কোনো বোধ ছিল না। যে জীবন সে পায়নি, যে জীবনের প্রতি তার কোনো তৃষ্ণা ছিল না, আজ তারই আকর্ষণে সে এক ভিন্ন মানুষ হয়ে উঠেছে। দাম্পত্যসম্পর্কের এই চরম বাস্তবতা গল্প দুটোর ভাবগত সাদৃশ্য গঠনে পালন করেছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।

অসম দাম্পত্যজীবনের নানা অসংগতি নিয়ে ভিন্নতর অভিজ্ঞতাসম্পন্ন গল্প 'পদাঙ্ক' (১৯৬১)তে সতীনাথ নারী-পুরুষের দাম্পত্যসম্পর্কের গতানুগতিকতা নিয়ে ব্যঙ্গ করেছেন। 'বউ নিয়ে ঘর করা যাদের একবার অভ্যাস হয়ে গিয়েছে, বিয়ে না করলে তারা অবধারিত পাগল হয়ে যায়'। (সতীনাথ, ১৪১৯ : ৩২৯) তাই বিদেশিনী স্ত্রী এমিলির মৃত্যুর পর তার অভাব পূরণ করতে প্রৌঢ় বোসসাহেব বিয়ে করে ঘরে নিয়ে আসেন কন্যা-স্থানীয় রেবাকে। বোস সাহেব রেবার মধ্যে খুঁজে পেয়েছেন দাপুটে এমিলির প্রতিচ্ছবি। স্বামীকে জুতো দিয়ে প্রহার করা কিংবা খাট থেকে ঘুমন্ত স্বামীকে ফেলে দেয়ার মধ্যে এমিলির যে পতিপ্রেমের পরিচয় পেয়ে স্বস্তি পেতেন বোস সাহেব, প্রথম পর্যায়ে রেবার শান্ত, নির্লিপ্ত আচরণে তা সম্পূর্ণই অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায় তাঁর কাছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত জুতো পেটা না করলেও এমিলির পদাঙ্ক অনুসরণ করে খাট থেকে সযত্নে স্বামীকে ঠেলে ফেলে দিয়ে রেবা তার অসম দাম্পত্যের সফল পরিণতি ঘটাতে চেয়েছে। আসলে বৃদ্ধ বোস সাহেব তাঁর তরুণ বয়সের দাম্পত্যজীবনে স্ত্রী কর্তৃক অবহেলা আর উপেক্ষামিশ্রিত ভালোবাসা পেয়েছেন তারই পুনরাবৃত্তি ঘটেছে রেবার উক্ত আচরণের মধ্য দিয়ে। বস্তুত অসম দাম্পত্যের অসঙ্গতি এ গল্পের এক উজ্জ্বল দিক। প্রৌঢ় স্বামীর বিচিত্রমুখী আচরণে সাময়িক অসন্তোষ প্রকাশ করলেও রেবা তার মানবতাবোধ এবং দায়িত্বশীলতার প্রয়োজনে এরূপ দাম্পত্যসম্পর্ককে সহজভাবে গ্রহণ করে নিয়েছে। সমালোচক গোপাল হালদার যথার্থই বলেছেন :

> সচেতন অন্তঃশীল অনুকল্পনায় মানব স্বীকৃতি— acceptance of man ভুল ভ্রান্তি সঙ্গতি-অসঙ্গতি ভরা মানুষকে সকল অসঙ্গতি সুদ্ধ মানুষ বলে গ্রহণ এই সহৃদয় মানবতা সতীনাথের স্বভাবগত। (গোপাল, ১৯৭৮ : ১২৭)

সতীনাথ ভাদুড়ীর গল্পে নর-নারী সম্পর্কের প্রধান উপজীব্য দাম্পত্যজীবন। এ জীবন কল্পনায় বোনা রঙের প্রলেপ নয়, তা ব্যক্তির পারস্পরিক আচরণ ও বোধের সঙ্গে সম্পৃক্ত। সতীনাথ তাঁর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে ব্যক্তির গহনতম প্রদেশ থেকে তুলে এনেছেন দাম্পত্যজীবনের নানা অসংগতি আর অসন্তোষের চিত্র। সমাজ-অর্থনীতি শাসিত এবং মনস্তত্ত্ব-নিয়ন্ত্রিত নারী-পুরুষের দাম্পত্যজীবনের আলো-অন্ধকারময় যে চিত্র সতীনাথের গল্পে অঙ্কিত হয়েছে তা স্বকীয় এবং স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে ভাস্বর।

গ্রন্থ ও প্রবন্ধপঞ্জি

অনিন্দিতা বন্দ্যোপাধ্যায় (২০০৫), *প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছোটগল্প : মননে ও সৃজনে*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা।

অরূপকুমার ভট্টাচার্য (১৯৮৪), *সতীনাথ ভাদুড়ী : জীবন ও সাহিত্য*, পুস্তক বিপণি, কলিকাতা।

গোপাল হালদার (১৯৭৮), *সতীনাথ ভাদুড়ী : সাহিত্য ও সাধনা*, অয়ন, কলকাতা।

দেবকুমার সাহা (২০০৭), *সতীনাথ বিচিত্রা*, গ্রন্থমেলা, কলকাতা।

প্রবীর ঘোষ (১৯৯৩), *সংস্কৃতি : সংঘর্ষ ও নির্মাণ*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

পার্থ চট্টোপাধ্যায় (২০০৮), *বাঙালি জীবনে সম্পর্ক*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

রফিকউল্লাহ খান (২০০২), *কথাসাহিত্যের বিচিত্র বিষয় ও নন্দনতত্ত্ব*, অনন্যা, ঢাকা।

শ্রাবণী পাল (২০০৬), "সতীনাথ ভাদুড়ীর ছোটগল্প : একটি সমীক্ষা", আফিফ ফুয়াদ (সম্পা.) *দিবারাত্রির কাব্য*, সতীনাথ ভাদুড়ী সংখ্যা, কলকাতা।

সতীনাথ ভাদুড়ী (১৪১৮), *সতীনাথ রচনাবলী (১)*, শঙ্খ ঘোষ ও নির্মাল্য আচার্য (সম্পা.), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা।

সতীনাথ ভাদুড়ী (১৪১৯), *সতীনাথ রচনাবলী (২)*, শঙ্খ ঘোষ ও নির্মাল্য আচার্য (সম্পা.), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা।

সতীনাথ ভাদুড়ী (১৪১৯), *সতীনাথ রচনাবলী (৩)*, শঙ্খ ঘোষ ও নির্মাল্য আচার্য (সম্পা.), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা।

সন্তোষকুমার মজুমদার (১৩৯২), *সতীনাথ : জীবন ও সাহিত্য*, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা।

সিরাজ সালেকীন (২০০৬), *জীবনানন্দ দাশের ছোটগল্প : জীবনজিজ্ঞাসা ও শৈলীবিচার*, ঐতিহ্য, ঢাকা।